শিল্পী শেখ আফজালের চিত্রকর্ম

জাগতিক রূপবৈভব ও মানবিক মুহূর্ত

মারুফ রায়হান

রাজধানীর গুলশানের সাজু আর্ট গ্যালারিতে শুরু হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের এসোসিয়েট প্রফেসর শিল্পী শেখ আফজালের বাইশতম একক চিত্র প্রদর্শনী। চলবে ১৭ জুলাই পর্যন্ত। প্রদর্শিত ছবির সংখ্যা বাহান্ন। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জাপানের রাষ্ট্রদূত মাতশুশিরো হোরিগুচি। জাপানের সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই শিল্পীর ছবিতে দু'দেশের চিত্রকলার ঐতিহ্যের সম্মিলন ঘটেছে বলে রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন শিল্পী রফিকুন নবী ও সৈয়দ জাহাঙ্গীর।

শেখ আফজালের কোনো কোনো ছবি নয়নলোভন ফটোগ্রাফের মতো; বাস্তবিকই 'ছবির মতো সুন্দর'। তাতে বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়। এ বিষয়ে উদাহরণ দিতে গেলে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং বান্দরবানে পাহাড়ের ওপরে বসতির প্রসঙ্গ প্রথমেই মনে আসবে। সেই সঙ্গে গ্রামবাংলার ঋতুভিত্তিক জীবনের কথাও তুলতে হবে। নিসর্গসৌন্দর্য কখনো বাস্তবতার অবিকল ব্যঞ্জনা নিয়ে তার চিত্রপটে উপস্থিত। কখনো বা তাতে এসে মিশেছে রহস্যলোকের ইঙ্গিত। উভয় ক্ষেত্রে ড্রইংয়ের মুন্সিয়ানা এবং কম্পোজিশনের বাহাদুরি অনুভব করা যায়। দৃশ্যমান সৌন্দর্যের ভিউ এবং অ্যাঙ্গেল নির্বাচনেও শিল্পীর দক্ষতা ঈর্ষণীয়। নিসর্গের ছবি প্রধানত জলরঙেই আঁকা, তবে তাতে জাপানি সুমি (Sumi) কালারের শক্তিশালী স্পর্শ আছে। সুমি নামে পরিচিত এই জাপানি কালো রঙটি দিয়ে আফজাল কেবল ড্রইং করেননি, অন্য রঙের সঙ্গে মিশিয়ে সেই রঙের প্রকৃতিও বদলে দিয়েছেন। বিশেষ করে নীল রঙের ক্ষেত্রে এটা তিনি বেশি করেছেন। ফলে আকাশ, আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত আলো এবং নদীর জলে আকাশের ছায়া– সকল ক্ষেত্রে নীলের স্বাতন্ত্র্য এসেছে যা তার চিত্রপটকে বিশেষত্ব দিয়েছে।

'বান্দরবান : হাউসেস অ্যাট হিলটপ' সিরিজের ছবিগুলো ডিটেইল ওয়ার্কে সমৃদ্ধ।

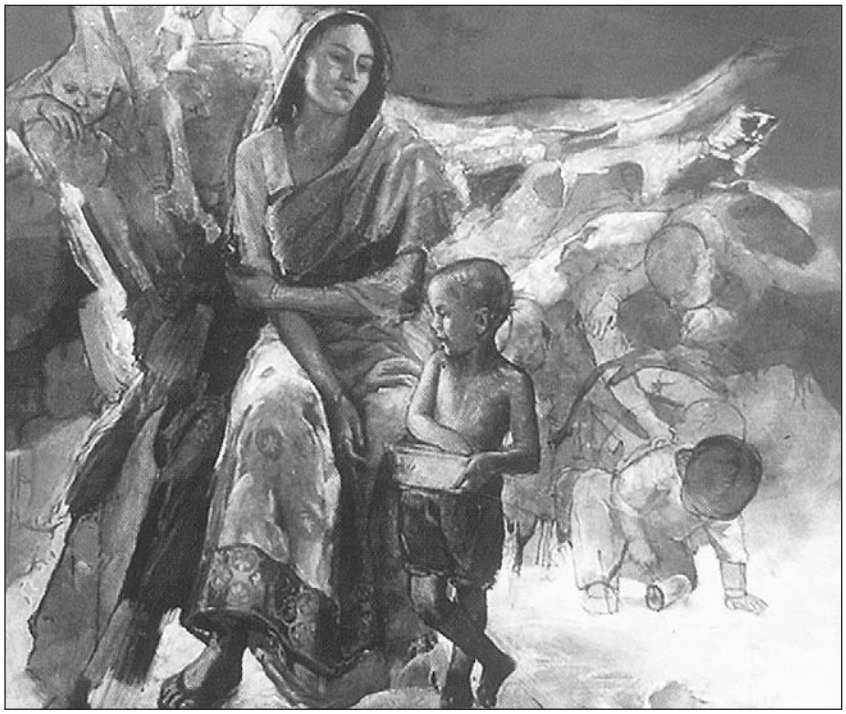

পাহাড়ের ওপরে সবুজের সান্নিধ্যে পাহাড়িদের সপ্রাণ জীবনযাপনের এসব ছবিতে আলো-ছায়ার প্রায়োগিক দক্ষতা লক্ষণীয়। সুমি টেকনিকের প্রয়োগে দূরের পাহাড়াঞ্চল রুক্ষতার বদলে পেয়েছে স্নিগ্ধতা; বিশেষ ঔজ্জ্বল্য ধারণ করায় ছবিগুলো হয়েছে আরো নজরকাড়া। অভিজ্ঞ জলরঙশিল্পীর মতো আফজাল জানেন কোথায় এবং কতটুকু লালরঙ ব্যবহার করতে হবে। এই সংযত প্রকাশ তার ছবিকে সুস্থিতি দিয়েছে। আরো একটি কাজ করেছেন তিনি টেকনিকের ক্ষেত্রে। সেটা হলো পটের একটি পাশের উন্মুক্ত স্পেসে সুমি কালারেই বাংলা শব্দলতিকার কম্পোজিশন করেছেন। কখনো আবার রঙের অবলেপন দিয়ে স্পেস রচনা করে নিয়ে সেখানে অক্ষরমালা প্রতিস্থাপন করেছেন। এই নিরীক্ষা তিনি বেশ কয়টি নিসর্গচিত্রে করেছেন। এর অনিবার্যতা অবশ্য এস্টাবলিশ হয়নি।

সুন্দরবনের প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় মেশামেশি হয়ে আছে প্রধানত নদী, নদীতীরের গোলপাতা, জঙ্গলের অভ্যন্তরের সুন্দরী গাছ এবং হরিণসহ অন্যান্য প্রাণী। শেখ আফজাল এসব স্মরণে রাখেন। জলরঙ এবং সুমি ও জলরঙ মাধ্যমে রচিত সুন্দরবনের ছবিগুলোয় প্রকৃতির এসব অনুষঙ্গ দৃশ্যমান হয়। কখনো তুলির কয়েকটি টানে ফুটিয়ে তোলেন বৃক্ষের আবছা অবয়ব; কখনো আবার আরেকটু রিয়েলিস্টিক ফর্মে আঁকেন গোটা গাছকে। যদিও গ্রামবাংলার নৈসর্গিক দৃশ্য রচনার সময় আঁকেন বিশদভাবে, সুপার-রিয়েলিস্টিক ফর্মেই। 'উইন্টার মর্নিং' সিরিজের ছবিতে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শীতের সকালের রোদে

‘আমার নিসর্গচিত্রেও জীবনের গল্প থাকে’

শেখ আফজাল

সাপ্তাহিক ২০০০ : এই প্রদর্শনীর প্রস্তুতি আপনার কতদিনের?

শেখ আফজাল : প্রায় এক বছরের।

২০০০ : এক বছরে ৫২টি নতুন কাজ?

আফজাল : ঠিক না নয়, ৩০টি নতুন কাজ, যা গত এক বছরে করেছি। বাকিগুলো তারও আগের এক-দেড় বছরের মধ্যে করা।

২০০০ : এই প্রদর্শনীর যদিও কোনো নাম নেই, তবে এতে নিসর্গ- সৌন্দর্যই প্রধান হয়ে উঠেছে; এবং কিছু মানুষের দৈনন্দিন জীবন।

আফজাল : হ্যাঁ, নাম দিইনি, কারণ এই প্রদর্শনীতেও আমার প্রধান দিক হচ্ছে ফিগার। তাই আলাদাভাবে নাম দিইনি আর। মানুষের জীবনই ছবিগুলোর উপজীব্য।

২০০০ : এই প্রদর্শনীর নেপথ্যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য এবং প্রেরণা কাজ করেছে কি?

আফজাল : আমি প্রতিবছরই অন্তত একটি করে একক চিত্র প্রদর্শনী করি। সেটা বাংলাদেশেও হতে পারে আবার দেশের বাইরেও হতে পারে। যেমন এই প্রদর্শনীর দু'মাস পরই আমি জাপানে আরো একটি প্রদর্শনী করতে যাচ্ছি। আমি নিয়মিতভাবেই চর্চা করি। চর্চার ভেতর দিয়ে ছবিতে পরিবর্তন আসে। সেটা মোটিফের দিক দিয়েও হতে পারে, আবার অন্য ক্ষেত্রেও হতে পারে। তবে প্রায় সব সময়েই অবজেক্ট হিসেবে ফিগার থাকেই আমার ছবিতে। এবারেও আছে। তবে নতুনত্ব বলতে এই যে সুন্দরবন ভ্রমণের ফলে গাছের ফর্ম ঘুরে ফিরে এসেছে। শুধু সুন্দরবন না, আমি কিছুকাল আগে ফেলোশিপ নিয়ে জাপানে গিয়েছিলাম ‘সুমি পেইন্টিং’-এর ওপর শিক্ষা নিতে। তখন জাপানের গাছপালাও আমাকে প্রভাবিত করে। ওখানকার অ্যাডভাইজারের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে বড় বড় বটগাছের ফর্মও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবারের প্রদর্শনীতে তার একটা প্রভাব পড়েছে। পাশাপাশি ফিগার তো আছেই। একদিকে প্রাচীন বৃক্ষ, তার ফর্ম- অন্যদিকে নতুন দিনের শিশু- অর্থাৎ নতুন জীবন- এই দুটো বিষয়কে নিয়ে আসতে চেয়েছি।

২০০০ : নেচার স্টাডি তো আছেই এবারের প্রদর্শনীর ছবিতে। বিশেষ করে সুন্দরবন এবং বান্দরবান। এর বাইরে যে জিনিসটি প্রধান হয়ে উঠেছে বলে আমার মনে হয়েছে সেটা হলো হিউম্যান ফিগার। এসব ছবিতে মানবজীবনের একটি গল্প ধরা আছে। যেমন ‘দ্য লেডি ইন লাভ’, ‘গসিপ’, ইনটিমেসি’, ‘কম্পোজিশন-৩’- এসব ছবিতে প্রকাশিত উপাখ্যানটির পেছনেও যেন রয়েছে আরো অনেক গল্প, আবছাভাবে।

আফজাল : হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন তবে আমার ল্যান্ডস্কেপেও জীবনের গল্প থাকে। সেখানেও মানুষ রয়েছে। আমার ছবিতে শিশুরা কিন্তু ঘুরে ফিরে আসে। ওদের বডি স্ট্রাকচার আমার নজর কাড়ে। ছাত্র জীবন থেকে আমার ছবিতে শিশুরা রয়েছে। আগের তুলনায় আমার ছবিতে এখন ফিগার রিয়্যালিস্টিকভাবেই আসছে। আগে আমার ধারণা ছিল রিয়্যাল ফিগার আঁকলে সেটা মডার্ন পেইন্টিং হয় না। জাপানে গিয়ে আমার এই ভুলের অবসান হয়েছে। আমার কনসেপ্ট এবং উপস্থাপনা যদি আধুনিক হয় তাহলে সেটা বাস্তবসম্মত করি কিংবা অ্যাবস্ট্রাক্টই করি সেটাও আধুনিক চিত্রকলাই হবে।

২০০০ : রিয়্যালিস্টিক ফিগার এতো জীবন্ত যে ফটোগ্রাফের দ্যোতনা আনে। আপনি গল্প-উপন্যাসের ইলাস্ট্রেশনও করেন পত্রিকায়। সেই ইলাস্ট্রেশন এবং এই ছবির মানুষের অবয়ব

প্রকৃতির ছন্দ সুন্দরবন

ডুবে যাওয়া পথ, কাজে বেরিয়ে পড়া গ্রাসবাসীর পোশাকের রঙ এবং সারি সারি খেজুর গাছ, তাতে রসের কলস লাগানো– বিস্তারিত চোখে পড়ে। বড় বড় খেজুর গাছ ক্যানভাসের অনেকখানি জুড়ে থাকে।

আফজালের প্রকৃতিবিষয়ক চিত্রমালায় গাছের এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে উপস্থাপন প্রদর্শনীকে অন্যতর বৈশিষ্ট্য দান করে। ক্যানভাসে মিশ্র মাধ্যমে রচিত সুন্দরবনকেন্দ্রিক একটি ছবিতে বৃক্ষ তার বিপুল বিশালত্ব নিয়ে উপস্থিত, কয়েকটি হরিণ-হরিণীর নির্বিঘ্ন বিচরণ ওই বিশালত্বকে দেয় এমন মহিমা যাকে ঠিক ইহজাগতিক বলা চলে না। একদিকে জাগতিক, অত্যন্ত জীবন্ত সাবজেক্ট; অন্যদিকে জাগতিক অবজেক্টেরই অন্যরকম উপস্থিতি– এই দুইয়ের সমন্বয় ও ছন্দ তার ছবিকে অভিনব করে তোলে। প্রাচীন বৃক্ষের মোটিফ বারবার ঘুরেফিরে আসতে থাকে তার ছবিতে এবং এটাই যেন বর্তমান প্রদর্শনীর শনাক্তযোগ্য চারিত্র হয়ে ওঠে।

একই আলোকে বিবেচনা করা যায় ‘গসিপ’ ছবিটি। তেলরঙে আঁকা এই ছবিটির ক্যানভাসজুড়ে বৃক্ষকাণ্ডেরই আধিপত্য। তারই এক ক্ষুদ্র অংশে প্রতিস্থাপিত কয়েকজন মুখোমুখি দণ্ডায়মান নারী। যেন সাজেস্টিভ (Suggestive)মঞ্চে সংলাপরত কতিপয় কুশীলব। ‘সাজেস্টিভ (Suggestive) মঞ্চে’ মানবিক মুহূর্তের ছবি পাওয়া যায় বেশ কিছু। তাতে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের উপস্থিতি অত্যন্ত জীবন্ত ও অভিব্যক্তিময়। একথা না বললেও চলে যে আফজালের ছবিতে শিশু ও নারী আসে তার সনাতন রূপটি ধরেই। শিশু সম্ভাবনাময়, নিষ্পাপ ও অনুসন্ধিৎসু। নারী সৌন্দর্য, মমত্ব ও কর্মকুশলতার প্রতীক। এতো গেল ছবিতে মানবশ্রেণীর গল্পের একটি দিক। অন্য দিকও আছে।

সেটি হলো সুনির্দিষ্টভাবে তাৎক্ষণিক মুহূর্তের প্রকাশ এবং নেপথ্যে অভিন্ন বা পৃথক

যেন পৃথক করা যায় না। এতোটাই রিয়্যালিস্টিক।

আফজাল : এমন সমালোচনা তো হতেই পারে যে ক্যানভাসের ভেতর রিয়্যালিস্টিক ফিগার থাকলে সেটা ইলাস্ট্রেশন হয়। আমি তো বলবো, ইলাস্ট্রেশন কঠিন জিনিস। বড় বড় মাস্টার পেইন্টাররা ইলাস্ট্রেশন করেছেন। বিদেশে নামীদামী শিল্পীরা বিগ ক্যানভাসে যে ছবি আঁকেন সেটাই পত্রিকার পাতায় ইলাস্ট্রেশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এমন কোনো কথা নেই যে ছবির ভেতর ফিগার দিলে সেটা ইলাস্ট্রেশন হবে। ইলাস্ট্রেশন একটি কঠিন কাজ। আর এই কঠিন কাজটিতে এগিয়ে আসতে চান না অনেক শিল্পীই। আমি তো বলবো ইলাস্ট্রেশন করার জন্য শিল্পীর বিশেষ ক্ষমতা থাকতে হয়। সবাই সেটা পারেন না।

২০০০ : প্রাচীন চৈনিক চিত্রকলায় আমরা লক্ষ্য করি যে চিত্রকলার অংশ হিসেবে হরফ ব্যবহৃত হয়। ওই হরফ ভার্টিকালি বা লম্বভাবে থাকে ক্যানভ্যাসের একপাশে। আপনার ছবিতেও বাংলা শব্দ সেভাবেই এসেছে। বাংলা ভাষা অবশ্য বাম থেকে ডানে পাশাপাশি লিখতে হয়। অথচ আপনি ওপর থেকে নিচে শব্দ ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এটা কি চীন বা জাপানের বিশেষ স্টাইলেরই অনুসরণ?

আফজাল : হ্যাঁ, আমি ওখান থেকেই নিয়েছি। যদিও এটাকে 'অনটেস্ট' বলতে পারেন। এবারই প্রথম করে দেখলাম কেমন লাগে। তবে ভবিষ্যতে বাংলা শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করলে আমি ছবিতে ওপরে নিচে নয়, পাশাপাশিই লিখবো।

২০০০ : আচ্ছা প্রকৃতির যে সব ছবি আপনি এঁকেছেন, এসব কি স্পটে বসেই আঁকা?

আফজাল : না, না। আমি স্কেচ করে নিয়ে আসি, তারপর ঢাকায় আমার স্টুডিওতে বসে স্মৃতি থেকেই আঁকি। সেখানে কম্পোজিশনের স্বার্থে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ বর্জন ঘটছে।

২০০০ : প্রদর্শনীতে জলরঙে আঁকা এসব নিসর্গচিত্র আঁকতে গিয়ে সিনিয়র কোনো শিল্পীর প্রেরণা ও প্রভাব কি কাজ করেছে আপনার ওপরে?

আফজাল : অবশ্যই। জয়নুল আবেদিন স্যার, নবী (রফিকুন নবী) স্যার- এঁদের প্রভাব আছে। লুৎফুল হক, অলকেশ ঘোষ- এদের সঙ্গেও আমি একসঙ্গে বসে ছবি এঁকেছি। ইনফ্লুয়েন্স তো আসবেই।

২০০০ : এবারের প্রদর্শনীটি আপনার ২২তম একক চিত্র প্রদর্শনী। এর আগের ২১টি প্রদর্শনী থেকে এই প্রদর্শনীর কি কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে?

আফজাল : কিছু কিছু নতুনত্ব আছে, তবে ব্যাপক কোনো চেঞ্জ নেই। সেটা করা ঠিকও না। তাহলে শিল্পীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আর থাকে না। আমার ধারাবাহিকতা আমাকে রক্ষা করতে হবে। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। 'চিত্রক' গ্যালারিতে আমার এক প্রদর্শনীতে নতুন কিছু কম্পোজিশন দেখে একজন জাপানি দর্শক গ্যালারি প্রধানকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে এটা কি শেখ আফজালেরই ছবি যিনি হিউম্যান ফিগার আঁকেন? তিনি কি ফিগার আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন? আমার তো মনে হয় না বাংলাদেশের কোনো দর্শক আমার বা কারোর ছবির পরিবর্তন দেখে এ ধরনের প্রশ্ন করবেন। জাপানের বড় বড় শিল্পীদের প্রদর্শনীতে দেখেছি তারা পনেরো-কুড়ি বছর আগে যে রকম ছবি এঁকেছেন সেই একই রকম একই ধারার ছবি আজও এঁকে যাচ্ছেন। কিছু কিছু পরিবর্তন যা এসেছে তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মনমানসিকতার পরিবর্তনের কারণে। কিন্তু মূল সুর একই থেকে যাচ্ছে। একজন শিল্পীর পক্ষে শিল্পকলায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসা অনুচিত।

২০০০ : শুরুতে বলেছিলেন যে, আপনি প্রতিবছরই একক চিত্র প্রদর্শনী করেন। দর্শকদের কাছে নিয়মিতভাবে পৌঁছানো কিংবা ছবি বিক্রি করার চিন্তা- এর পেছনে কাজ করে কি না?

আফজাল : আসলে দু'ধরনের শিল্পী আছেন পৃথিবীতে। এক ধরনের শিল্পী নিয়মিতভাবে ছবি এঁকে যান, প্রদর্শনী করেন। আরেক ধরনের শিল্পী কম আঁকেন, কম প্রদর্শনী করেন। ফুলটাইম এনগেইজ থাকা একজন শিল্পীর জন্য বিশেষ দক্ষতাই মনে হয়। এটাই উচিত। নিয়মিত ছবি আঁকার একটি তাড়া থাকা উচিত। নিয়মিত প্রদর্শনী করলে এটা হয়। যদি আমি এটা না করতাম তাহলে কি হতো? বছরে দুটো-তিনটে ছবি আঁকতাম, তারপর সারা বছর ঝিম ধরে বসে থাকতাম। এটা এক ধরনের স্থবিরতা। ফুলটাইম আর্টিস্ট নিয়মিতভাবে আঁকবেন, এক্সপেরিমেন্ট করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। তবে প্রতিবছরই প্রদর্শনী করা কঠিন।

২০০০ : আপনার একটি ছবির একাধিক ক্রেতা থাকলে আপনি কি কপি করেন সে ছবিটির?

আফজাল : এটা পারি না। তবে ছবির অর্ডার আছে কিছু। ছবি এঁকে দিলেই আমি টাকা পেয়ে যাবো। এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, আমি পারি না। আদৌ কখনো আমি এ প্রক্রিয়ায় যাবো কি না সন্দেহ আছে। আমি নিজের মতো করেই আঁকতে চাই। আমার আঁকা ছবি থেকে কেউ যদি পছন্দ করে কেনেন, তখন আমার সন্তুষ্টি আসে, ভালো লাগে।

একাকী

বহমান জীবনের প্রতিভাসের পাশাপাশি অবস্থান। ক্যানভাসে যদি, একটি ফিগার অত্যন্ত রিয়েলিস্টিক এবং অভিব্যক্তিময়, তবে তার পেছনে আবছাভাবে রয়েছে একাধিক মোটিফ এবং ফিগার। স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ফিগারের সঙ্গে অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ মোটিফ ও ফিগারের সম্বন্ধ ও দ্বন্দ্ব রঙ এবং বুনটের দৃঢ়তায় একইসঙ্গে একটি ছবিকে বাঙ্ময় এবং মৌন করে তোলে। এখানেই চলে আসে মূর্ত ও বিমূর্তের সম্বন্ধসূত্র এবং দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার প্রসঙ্গটি। 'প্লেয়িং এলোন' ছবিটির কথাই ধরা যাক, কিংবা 'ওয়েটিং' ছবিটির কথা। উভয় ছবিতে রয়েছে একটি করে হিউম্যান ফিগার। প্রথমটিতে দেখা যাচ্ছে হাঁটতে শেখেনি এমন বয়সী একজন শিশু আপনমনে খেলছে। দ্বিতীয়টিতে উপবিষ্ট একজন একাকী নারী, প্রতীক্ষারত। এখন উভয় ছবি থেকে যদি হিউম্যান বডি দুটিকে সরিয়ে নিয়ে সেখানে ক্যানভাসের বাদবাকি অংশের অঙ্কনরূপটিকে মার্চ করিয়ে দেয়া যায় তাহলেও ছবিটি অর্থহীন হবে না। ফলে দর্শকের মনে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা তৈরি হতে পারে যে, হিউম্যান ফিগারটি ক্যানভাসে আরোপিত কিনা। মূর্ত-বিমূর্তের মেলবন্ধন অত্যন্ত জটিল একটি কাজ। দুরূহ এই কাজটিতে অভিনিবেশদানের জন্যে শিল্পী শেখ আফজাল চিত্ররসিকদের শুভেচ্ছা পাবেন।

সবশেষে একটি ছবির কথা আলাদাভাবে উল্লেখ না করলেই নয়। Galloping horses বা 'দ্রুতগতিতে ধাবমান অশ্বদল' শিরোনামের এই ছবিটি প্রদর্শনীর দলছুট এবং দর্শনীয় একটি ছবি। শিল্পীর অঙ্কনশৈলীর শক্তিমত্তা এতে ভালোভাবেই প্রকাশিত। সময় ও গতির সাপেক্ষে ধাবমান অবজেক্টসমূহের অবস্থান পরিবর্তনের এই কঠিন বিষয়টিকে শৈল্পিক সুষমা ও টেকনিকের দক্ষতা দিয়ে সৃজন করেছেন শিল্পী শেখ আফজাল।